আমাদের ‘স্বামীজী’ : স্বামী পুণ্যানন্দ

হর্ষ দত্ত

প্রাক্তন সম্পাদক,
দেশ পত্রিকা

মন্বন্তর যখন অবসিত হয় তখন স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে—মানুষ-পোড়া ছাই। সেই ছাইগাদার ওপর শুয়ে থাকে কোনও নবজাতক। সর্বস্ব হারানো জন্মদাত্রী বাধ্য হয়েছে এই নিষ্ঠুরতম কাজ করতে—যে-কাজ অনিবারিত অশ্রুধারায় সিক্ত, পরিমাপহীন ব্যথায় প্লাবিত। যে-ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা এখানে আমরা বলছি, তা ১৯৪৩ সালে অভিসম্পাতের মতো নেমে এসেছিল কলকাতা সহ বাংলার বুকে। সেই সঙ্গে মেদিনীপুরে প্রবলতর বন্যার প্লাবনে হল এক অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় বিপর্যয়।

এই দুই আক্রমণ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে বাংলার তৎকালীন গভর্নর এবং মানবতাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দুটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। বন্যায় বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের ত্রাণকার্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বামী নির্বাণানন্দজী (সূর্য মহারাজ)। অপর দিকে কলকাতার সেবাব্রতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী পুণ্যানন্দজী (প্রিয়নাথ মহারাজ)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। অক্লান্ত ত্রাণ ও সেবাকার্যে সমাপ্ত হল মন্বন্তর। ঠিক এর পরের বছর, ১৯৪৪ সালে ধ্বংসাবশেষ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম নেবে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। বিধ্বস্ত জীবনপ্রবাহে ভেসে যাওয়া, ভাসতে থাকা অনাথ বালকদের জন্যে একটি আশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন অনুভব করে, ইংরেজ সরকার রামকৃষ্ণ মিশনকে এগিয়ে আসার প্রস্তাব দেয়। বেলুড় মঠ সেই অন্ধকারময় সমস্যার নিরসনে এগিয়ে আসে। অত্যন্ত জরুরি কাজটির রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় স্বামী পুণ্যানন্দের হাতে। গঠনমূলক সেবাকার্যের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি নির্ভয়চিত্তে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এখানে তাঁর পূর্ববর্তী কর্মযজ্ঞের কথা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যেতে পারে। কেননা এই পর্বগুলি পুণ্যানন্দজীর জীবন-ইতিহাসের অঙ্গ। ঢাকা জেলার শিমুলিয়া গ্রামের (এখন বাংলাদেশে অবস্থিত) এক দুরন্ত কিশোর তখন স্কুলের পড়া শেষ করে, সদ্য কলেজে ভর্তি হয়ে, যৌবনে

উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই সন্ধিলগ্নে প্রিয়নাথের যাতায়াত শুরু হয়েছে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে। তখন মঠের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল মহারাজ)। তরুণপ্রাণ যুবকদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ও অন্তরঙ্গতা। প্রিয়নাথের জীবন আত্মানন্দজীর সংস্পর্শে এসে দিক পরিবর্তন করল। তখন ১৯২১ সাল। মহারাজ তাঁকে বেলুড় মঠ, বিশেষত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করে আসার কথা বললেন। কলেজ ছাত্রটি আত্মানন্দজীর প্রেরণায় চলে এল ঢাকা থেকে কলকাতায়।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় মঠ। পূর্বপারের কুঠিঘাট থেকে নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে প্রিয়নাথ চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সন্দর্শনে। মঠবাড়ির দোতলায় প্রিয়নাথ দেখলেন এক ধ্যানগম্ভীর, দেবতাত্মা মহামানবকে। সেই প্রথম দর্শন, সব আকুলতার যেন অবসান! কিন্তু অন্তরে অনুভব করলেন স্রোতের টান, জাগরণের উপলব্ধি। পরবর্তী কালে সেই বিশেষ দিনটির কথা অভিভূত, বিস্মিত প্রিয়নাথ লিখেছিলেন গভীর আত্মনিবেদনে : ''প্রতীক্ষা শেষ হল। সময় হয়েছে। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। অতি সুমধুর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছ?' উত্তর দিলাম। বললেন, 'কোনো বাড়িতে গেলে বাড়ির যিনি বড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দাদা, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?' ত্রুটির কথা স্বীকার করলাম। বললেন, 'যাও দেখা করো।' এমনভাবে কথা কয়টি বললেন যে আজ জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও সেই মধুর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি, সে কমনীয় কান্তি আজও যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। উত্তরকালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণই এ ক্ষুদ্র জীবনের সম্বল হবে—এ কি তারই ইংগিত?

''অতিথিভবনের নিম্নতল, যেখানে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা মহারাজকে প্রণাম করেছি কি না। আমার উত্তর শুনে বললেন, 'তবেই হয়েছে। আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না।' গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কী শ্রদ্ধা, কী ভালোবাসা!'' (উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৭৭)

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগে মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য ও আশ্রিত প্রিয়নাথকে সেবাকার্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন কাঁথির এক সমাজসেবী মুকুন্দ বসু। তাঁর আহ্বানে তিনি কলেজের পড়াশোনায় ইতি ঘটিয়ে চলে গিয়েছিলেন তখনকার নিবিড় গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতি কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। ১৯২২ থেকে ১৯৩২—একটানা দশ বছর কাঁথি আশ্রমটিকে পুণ্যানন্দজী একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রাণপাত করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির, অকম্প। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখানে কোনও বাধার সামনে কোনও নির্মাতাই নতি স্বীকার করেন না। তাঁর ভেতরের আগুন জ্বলতেই থাকে। এই পর্বেই তিনি গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য লাভ করে হয়েছেন ব্রহ্মচারী পরচৈতন্য, তারপর সম্যকরূপে সমস্ত কিছু ন্যাস করে সন্ন্যাসী স্বামী পুণ্যানন্দ।

তৎকালীন বর্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র ছিল। স্থান রেঙ্গুন। মিশনটি আদতে একটি দাতব্য হাসপাতাল বা সেবাশ্রম। কাঁথি থেকে পুণ্যানন্দজীকে ১৯৩২-এ পাঠানো হল রেঙ্গুনে। এখানেও তাঁর কার্যকাল দশ বছর। যুদ্ধবিদ্ধস্ত রেঙ্গুন ও জাপানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের ইঙ্গিত সত্ত্বেও, তাঁর তত্ত্বাবধানে এই সেবাশ্রমটি হাসপাতাল হিসেবে যে-সেবা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে দিয়েছিল, তার পরিমাপ

হয়নি। সে এক অপরিমেয় কর্মচঞ্চলতা। ইতিহাসের ধূসর পাতায় তা আজ বিলীন হয়ে গেছে।

জাপানি সৈন্যরা একসময় রেঙ্গুন পুরোপুরি দখল করে অত্যাচার শুরু করার পর, সেবাশ্রমের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে, পুণ্যানন্দ বিষণ্ণ ও ক্লান্ত চিত্তে ভারতে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন অন্যান্য সহযোগী মহারাজরা। বাংলায় দুর্ভিক্ষ না হলে হয়তো পুণ্যানন্দজীকে ইংরেজ সরকারের অনুরোধে রিলিফ ওয়ার্ক পরিচালনার জন্য পুনরায় রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হত। বর্মা রিফিউজিদের দেখাশোনা করার মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। প্রিন্সিপাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করার কিছু পরে, তাঁর দেশজননী বাংলা তাঁকে যেন উদাত্ত আহ্বানে বলেছিল, ''যেতে নাহি দিব।'' ইংরেজ সরকারের শিক্ষাবিভাগ এবার রামকৃষ্ণ মিশনকে অনুরোধ জানাল, আপনারা অনাথ শিশুদের ভার নিন। এরা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে জীবন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবিকতার নিরিখে এদের আমরা ফেলে দিতে পারি না। অনাথ বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিচর্যা ও নিঃস্বার্থ সেবাকার্য করতে পারে একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন। পুণ্যানন্দজী যেন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে, সরকারের এই অনুরোধকে যেভাবে হোক বাস্তবায়নের কাজে আত্মোৎসর্গের সংকল্প গ্রহণ করলেন। এক অকল্পনীয় সুযোগে তাঁর ভাবনা, অগতির গতি ও অনাথের নাথ শ্রীরামকৃষ্ণের অপার কৃপায় এক অনড় ভিত্তিভূমি লাভ করল। শ্রীঠাকুরের কৃপাধন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র এবং তাঁর পত্নী ইন্দুপ্রভা দেবী তাঁদের রহড়া গ্রামে অবস্থিত বিপুল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুণ্যানন্দজীর হাতে তুলে দিলেন। তাঁদের অকালপ্রয়াত পুত্র রামচন্দ্র ও কন্যা প্রীতির স্মৃতিরক্ষার্থে স্থাপিত হল বালকাশ্রম। পুণ্যানন্দের জীবনে সেই পরম পুণ্যদিনটি ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সাল।

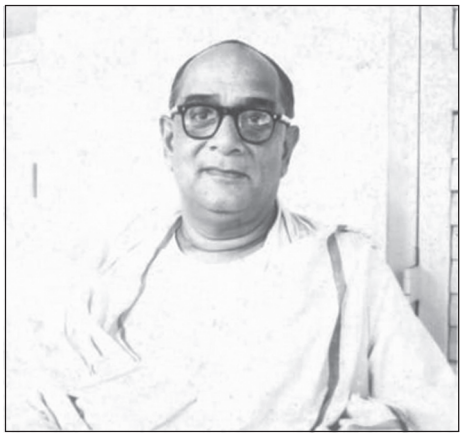

স্বামী পুণ্যানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় স্বামী মাধবানন্দজী এক আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানে অথচ শুভলগ্নে অনাথ বালকরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার সূচনা করেছিলেন। দান হিসেবে প্রাপ্ত একটি অপরিসর পাকা বাড়িতে, সাঁইত্রিশজন অনাথ বালককে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র অর্ঘ্য নিবেদন করে শুরু হল বালকাশ্রমের অভিযাত্রা। ছিন্নমূল নাবালকদের কাছে পুণ্যানন্দ হয়ে গেলেন 'স্বামীজী'। আমৃত্যু তিনি রহড়া আশ্রম এবং চতুষ্পার্শ্বের লোকালয়ে, এই পরিচয়েই প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছিলেন।

আর একটি অভিনব ও আশীর্বাদসদৃশ ঘটনা ঘটল কয়েক মাস পরেই। ঘটনাটি এই : ''১৯৪৪ সালেই ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েভল্-এর পত্নী এই আশ্রম পরিদর্শন করেন ১৭ ডিসেম্বর তারিখে। স্বামীজীকে [পুণ্যানন্দজী] তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আশ্রমের কোনো আর্থিক সমস্যা আছে কি না। স্বামীজী উত্তর দিলেন, আর্থিক সমস্যাকে তিনি বড় সমস্যা মনে করেন না। কাজ

ঠিকমতো করলে ভগবানের ইচ্ছায় প্রয়োজনমত অর্থ আসবে। ওয়েভল্-পত্নী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'What will be the standard of your success?' (কি হলে আপনার কাজ সার্থক হয়েছে বলে মনে করবেন?) স্বামীজী উত্তর করেছিলেন, 'The day I can remove from the mind of these boys that they are orphans.' (যেদিন এদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারব যে এরা অনাথ সেদিনই আমি মনে করব কৃতকার্য হয়েছি)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐদিন রাত্রিতেই লেডী ওয়েভল্ একখানি পঁচিশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।" [সূত্র : স্বামী পুণ্যানন্দের প্রয়াণের পরে প্রকাশিত স্মরণ পুস্তিকা]

একজন দারিদ্র্যপীড়িত, অভাজন, নিঃসম্বল বালক হিসেবে এই আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিলাম ১৯৬৬ সালে। তখন আমি বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভ পাস করে সিক্সে উঠেছি। কারও কাছ থেকে জেনে মা আমাকে নিজে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। আশা-নিরাশার দোলাচলে মায়ের অশ্রুধারা যেন বাধা মানছে না। আজ প্রায় সাতান্ন বছর আগের সেই মুহূর্তটি এখনও আমার অন্তরে গভীর দাগ কেটে রেখেছে। মৃদু ধমক দিয়ে সুপুরুষ, ঋজু সন্ন্যাসী মাকে বলেছিলেন, ''কাঁদছেন কেন? ঠাকুর যখন তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। চোখের জল বড় দামি। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধুইয়ে দিতে কাজে লাগে।" তারপর আমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সাদরে জানালেন, ''বাবা, কাল সকালেই চলে এসো। আজ বাড়ি যাও। জামা-প্যান্ট আর দরকারি জিনিস যদি থাকে ব্যাগে করে নিয়ে আসবে।"

মাকে এরপর বলেছিলেন, ''আপনাকে ফর্ম ভরতে হবে। নিয়মকানুন অফিস থেকে পেয়ে যাবেন, সেবাব্রতীরা দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আর একটি কথা, ছেলেকে কিন্তু ক্লাস ফাইভে আবার পড়তে হবে। বাইরের পড়াশোনার চেয়ে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড খানিক উঁচু।"

মা সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। অসম্মত হওয়ার মতো কোনও পথ সেই মুহূর্তে ছিল না। বলা বাহুল্য, সেদিনের কথাবার্তাগুলো যেভাবে সাজিয়ে লিখলাম, ঠিক এমনভাবে, এমন ভাষাভঙ্গিতে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিবেশটিকে নির্মাণের জন্যে স্মৃতি ও কল্পনার মিশ্রণ এখানে অবশ্যই আছে। তবে মোট কথা, স্বামীজী আমাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর সেই স্নেহনীড়ে ছিলাম ১৯৭৩ সালের অন্তিম সময় পর্যন্ত। তার দু-বছর আগে ১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখে তিনি প্রয়াত হন। প্রায় এক বছর আগে ক্যানসার ধরা পড়ে। কিন্তু একেবারে শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন।

স্বামী মাধবানন্দজী একদিন যে-বীজ, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে পাওয়া জমিতে রোপণ করেছিলেন, তা স্বামীজীর সময়কালেই অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে মহীরুহের আকার ধারণ করে। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও শাখাকেন্দ্রের অধীনে এতগুলো ইনস্টিটিউশন ছিল না—কেজি থেকে কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ থেকে টেকনিক্যাল এডুকেশন। বালকাশ্রম ছিল আমাদের গর্ব। অনাথ বলে কি একটু হীনম্মন্যতা মনে মনে ছিল না? হ্যাঁ ছিল, থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীজী আশ্রমের পরিবেশটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও নানা রূপময় ভবনে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, 'আশ্রমিক' শব্দটিই ছিল আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়।

স্বামীজীর দেহসৌষ্ঠব ছিল দেখার মতো। দীর্ঘকায়, পরিপাটি পোশাক, মুখে সর্বদা মধুর হাসির আভাস। এক ঝলকে মনে হত যেন নেতাজীর মুখাবয়ব! বিকেলবেলায় দুজন সেবক এবং

আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে হাঁটতে বেরোতেন। ওঁর সামনে পড়ে গেলে পরিচিতরা প্রণাম জানাতেন। অপরিচিতরা হাত জোড় করে নিবেদন করতেন নমস্কার। আশ্রমপ্রেমী মানুষদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে কখনও ভুলে যেতেন না। আশ্রমকে যাঁরা ভালবাসতেন, তাঁরাই ছিল তাঁর প্রেমাস্পদ এবং প্রাণসখা। রহড়া আশ্রমে তিনি একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। সেই পরিমণ্ডলে ছিল বক্তৃতা, পাঠ, সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, নাটক, ক্রীড়া এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর নামগান। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঘিরে কয়েকদিন উৎসব পালন রীতি হয়ে উঠেছিল। সেই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি ছিল প্রধান আকর্ষণ। পল্লির রাস্তাগুলিতে, বিশেষত আশ্রম সংলগ্ন রাস্তায় রীতিমতো মেলা বসে যেত। দুর্গাপুজো, রথযাত্রা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হত তাঁর সুপরিচালনায়। শুধু পড়াশোনার মান উন্নত করা নয়, স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন ছেলেদের প্রতিভা স্ফুরণে। কখনও কখনও বুঝতে পারতাম না। বক্তৃতা বা ধর্মকথা শ্রবণে অনীহা জাগত। কিন্তু জীবনের এই উপান্তে এসে অনুভব করি, সর্বত্যাগী কর্মযোগী পুণ্যানন্দের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। সীমাবদ্ধতায় নিজে আটকে থাকেননি, অন্যকেও আবদ্ধ রাখেননি।

বিনীতভাবে জানাই, স্বামীজীর অপার স্নেহ লাভ করেছিলাম। তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, বিশেষত যখন অসুস্থ ছিলেন। গলার দুপাশে যেখানে গ্ল্যান্ড আছে, সেখানে একটি নামী কোম্পানির সফ্‌ট ক্রিম, আলতো আঙুলে বুলিয়ে দিচ্ছি, উনি আমার বাঁ হাত নিজের হাতের উষ্ণতার মধ্যে চেপে ধরে আছেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছি, ''স্বামীজী কোথাও খোঁচা লেগে যায়নি তো!'' মুদিত চোখ একবার মেলে ধীর কণ্ঠে বললেন, ''না।... মনে রাখিস জীবন-যৌবন-ধনমান সবকিছু ভেসে চলে যায়। শুধু থেকে যায় প্রেম, প্রেম, প্রেম। ঠাকুরের অপার প্রেম আমি এই আশ্রমের প্রতিটি ইঞ্চিতে অনুভব করি।... তোরা বড় ভাগ্যবান, তাঁর প্রেমসমুদ্রে সাঁতার কাটছিস। আহা, কবিগুরু সেই যে লিখেছেন, 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।'... জয় রাধে, জয় রাধে প্রেমময়ী...।''

চোখ বুজে, একটু থেমে থেমে কথাগুলি বলছিলেন। হয়তো পারম্পর্য নেই। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর। সেই অল্প বয়সে কিছুই বুঝিনি। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু আজও কি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছি! শুধু এইটুকু মনে হয়, রহড়া আশ্রম ছিল তাঁর সর্বস্ব। অনাথ বালকরা ছিল তাঁর আরাধ্য দেবতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের অনেককেই তিনি দেখেছেন, তাঁদের পূত সঙ্গ লাভ করেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী যখন প্রেসিডেন্ট হয়ে বেলুড় মঠে ছিলেন, সেই সময় স্বামীজী তাঁর সেবা করেছেন। প্রতি রবিবার তখন রহড়ার মন্দিরে সকাল আটটা থেকে নটা পর্যন্ত (স্মৃতি হয়তো ভুলও বলতে পারে) স্বামীজী একটি ধর্মক্লাস নিতেন। শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের সম্পর্কে নানা বিষয়ের অবতারণা করতেন নানা রসে। সেই সঙ্গে শোনাতেন ধারাবাহিক ইতিহাস—কী অনন্ত ত্যাগের ওপরে একটু একটু করে উত্থিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন! তাঁর কথায়, এই সঙ্ঘ ত্যাগী ও সংসারীদের সমগ্র জীবনমন্থনের অবদান।

স্বামীজীর অনাড়ম্বর ঘরের দেওয়াল-আলমারির একটি তাকে থাকত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি। একটু তফাতে জগন্নাথদেব। সম্ভবত ছোট একটি দারুমূর্তি। মূর্তির সামনে নয়নপথগামী জগন্নাথস্বামীর মহাপ্রসাদে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র কৌটো। প্রতিদিন ওই প্রসাদ তিনি গ্রহণ করতেন। উত্তর দিকের দেওয়ালে টাঙানো ছিল তাঁর দীক্ষাগুরু মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী

শিবানন্দজীর আলোকচিত্র। আর পূর্ব দিকের দেওয়ালে স্বামী মাধবানন্দজীর ছবি। মাধবানন্দজী যেমন পুণ্যানন্দজীকে অসম্ভব ভালবাসতেন, তেমনই স্বামীজী তাঁকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মাধবানন্দজী তো ছিলেনই, তাছাড়াও স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রমুখ মহারাজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। শ্রীসারদা মঠ স্থাপনে এঁদের সঙ্গে পুণ্যানন্দজীও অগ্রপথিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এখন তাঁর প্রণম্য ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি, একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা মানে কাজ সম্পূর্ণ হল—এমনটা তিনি কখনই ভাবতেন না। অনিঃশেষ উৎসাহ নিয়ে রহড়া আশ্রমকে একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান করে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন তিনি সফল করতে পেরেছিলেন। এখানেই তিনি সার্থক কর্মযোগী। আশ্রমের প্রতিটি ছোট বা বড় কাজে তিনি অধ্যবসায় পছন্দ করতেন। কামনা করতেন নিষ্ঠা। ওঁর মধ্যে একটি চিরশিশু যেন ঘুমিয়ে থাকত। হঠাৎ হঠাৎ সে জেগে উঠত। একদিন রাতের আহার গ্রহণের জন্যে রাত নটায় ডাইনিং হলে ঢুকে দেখি, তিনি তদারকিতে ব্যস্ত! অথচ এখানে তখন তাঁর আসার কথা নয়। রান্না-খাওয়া দেখভালের জন্যে অন্য সাধু আছেন। স্বামীজী কোনও একটি পঙ্‌ক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছেন। পাতে রুটি পড়ছে। সেদিন যাদের পরিবেশনের দায়িত্ব, সেইসব উঁচু ক্লাসের দাদারা স্বভাবতই সেই মুহূর্তে বেশ কুণ্ঠিত, অকারণে সন্ত্রস্ত্র। তাদের রুটি পরিবেশন দেখে তিনি মোটেই খুশি হচ্ছেন না। আবার কিছু না বলে চুপ করে আছেন। বাটিতে ডাল এবং রুটির পাশে থালায় পড়ল কুমড়োর তরকারি। 'ব্রহ্মার্পণং' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণের পর খাওয়া শুরু। স্বামীজী উপস্থিত আছেন তাই হাপুস-হুপুস শব্দ, থালা-বাটির ঠোকাঠুকি কম হচ্ছে।

একটু পরেই দেখি স্বামীজী একগোছা রুটি গামলা থেকে একটি ছোট থালায় তুলে নিয়ে একেবারে প্রথম পঙ্‌ক্তির দিকে 'রোটি', 'রোটি' বলে হাঁক দিতে দিতে চলেছেন। যারা পরিবেশন করছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছেন, উত্তর ভারতে পঙ্‌ক্তিভোজনে এইভাবে রুটি পুনরায় দিতে দিতে চলে। ''ওরে তোরাও এমন কর। দেখবি, এই সামান্য ডিনারের সঙ্গে আনন্দ ফ্রি! ঘোমটা পরা বউয়ের মতো নিঃশব্দে খেলে হবে? দূর, তাতে খাওয়া জমবেই না। একটু চিৎকার চেঁচামেচি না করলে উদরপূর্তির পরিমাপ বোঝা যাবে কী করে?"

রহড়া আশ্রমের পাঁচিল ঘেরা চৌহদ্দির ঠিকানায় আমাদের কিশোর মন মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠত। আশ্রমিক জীবনের আস্বাদ গ্রহণের এত আয়োজন সত্ত্বেও, মার খাওয়ার ভয় উড়িয়ে দিয়ে, মাথার মধ্যে বাসা বাঁধত দুষ্টুমির ভূত। বিশেষ করে রবিবার ছুটির দিনে—'ঠিক দুপুর বেলা ভূতে মারে ঢ্যালা।' পাঁচিলের বাইরের জগৎ যেন আমাদের ডাকত—চলে আয়, চলে আয়। আয় বলে ডাকলেই তো আর প্রাচীর টপকানো যায় না! দু-তিনজনে মিলে ছক তৈরি করতে হত। দুপুরের আহারের পর কোন মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েন, কোন ওয়ার্ডেন বাইরে বেরিয়ে যান, দারোয়ানের গতিবিধি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে-বুঝে, পাঁচিল পেরিয়ে বাঁদিকে রহড়া বাজার, ডানদিকে স্টেশন পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করার আনন্দই ছিল আলাদা—মাত্রাহীন, বাধাহীন।

এই রকমই এক দুপুরে, সময় সম্ভবত বেলা একটা, আমি আর সতীর্থ সুকান্ত, আমাদের ব্রহ্মানন্দ ছাত্রাবাসের পিছনে অবস্থিত বিরাট দিঘিতে সাঁতার কাটতে যাওয়ার প্ল্যান করলাম। জায়গাটাকে সবাই বলত 'দিঘির পাড়'। ওই সময়ে স্বামীজী ডাইনিং হলে খেতে যান। অতএব ঠিক হল, সেন্ট্রাল

অফিসের কাছাকাছি যে-ছোট লোহার গেটটা আছে, সেটা টপকে দিঘিতে পৌঁছনো সহজ হবে। ছুটির রোববারে আশপাশ নির্জন থাকে। সুকান্ত ভার নিয়ে বলল, ''আমি নজর রাখছি। স্বামীজী ওঁর আবাস থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চলে গেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। শুধু যাওয়ার অপেক্ষা।''

দেড়টা নাগাদ আমি গামছা, শুকনো প্যান্ট, গেঞ্জি গুছিয়ে নিয়ে রেডি। কিন্তু সুকান্তর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা। জিজ্ঞেস করলাম, ''কী হল রে?'' ওর সংশয়ী উত্তর, ''আমি কিন্তু স্বামীজীকে যেতে দেখিনি। কী ব্যাপার কে জানে!'' অতি উৎসাহে বললাম, ''তুই হয়তো কোনও কারণে জানলা থেকে উঠে গেছিলি। স্বামীজী তখনই চলে গেছেন। চল বেরিয়ে পড়ি। তিনটের মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।''

কতক্ষণ সাঁতার কাটার পাগলামি করেছিলাম মনে নেই। তবে ওই বছরেই সাঁতার শিখেছি। ক্লাস সেভেন বা এইট। এখন অবশ্যই স্বীকার করব, সাঁতার শিখেই বড় দিঘির জলে দাপাদাপি করা, বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছিল। প্রাণসংশয় হতেই পারত। দুজনের ভেজা পোশাক একটা ছেঁড়া স্কুল ব্যাগে পুরে সেই ছোট গেটটা পুনরায় টপকে যেই আশ্রমে ঢুকেছি, তখন সবিস্ময়ে দেখছি, স্বামীজী সেন্ট্রাল অফিসের দিকে আসছেন! সম্ভবত আহার ও সামান্য বিশ্রাম সেরে, কোনও জরুরি কাজে, অফিসে ওঁকে আসতে হচ্ছে। সেই উন্নত শির। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ। আমাদের দুই মূর্তিকে দেখে ওঁর চোখের পলক পড়ছে না। অফিসের সিঁড়িতে পা না রেখে, সোজা আমাদের সামনা-সামনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমরা! কোত্থেকে আসছ? কোথায় গেছিলে?'' রাগে স্বামীজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। কঠিন গলার স্বর।

আমাদের মাথা নিচু। ভয়ে কাঁপছি। স্বামীজী আবার ধমকে উঠলেন, ''সত্যি কথা বলবে। এই ভরদুপুরে তোমাদের ছাত্রাবাসে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। বলো, কোনখানে ওই পোঁটলা নিয়ে... চুল ভিজে, তার মানে দিঘিতে সাঁতার কাটছিলে! আমি যা বলছি, তা কি ঠিক!''

সমস্বরেই চরম অপরাধীর মতো বললাম, ''হ্যাঁ, স্বামীজী।''

''এত দুঃসাহস! এত বড় আস্পর্ধা! তোমরা এই আশ্রমে থাকার উপযুক্ত নও। তলে তলে অমানুষ তৈরি হয়েছ। গেট আউট। কাল সকালেই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে।'' স্বামীজী তাঁর আজানুলম্বিত বাহু তুলে সোজা মেন গেট দেখিয়ে দিলেন।

''স্বামীজী, আমরা এমন কাজ আর করব না। এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। খুব ভুল করেছি।'' সুকান্ত কাঁদতে কাঁদতে স্বামীজীর পায়ে প্রায় আছড়ে পড়ল। আমিও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। আমারও দুচোখে জল। সশব্দে কান্না বেরিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে 'আর করব না স্বামীজী' বাক্যটি বলেই চলেছি। স্বামীজী আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না। ঝাপসা চোখে দেখলাম, ওঁর সেবক রামদা অফিসের প্রধান দরজার তালা খুলছে। রামদারও মুখ থমথমে। রহড়ার যে-কয়েকজন ছাত্র ওখানে থেকেই কলেজে পড়ার সুযোগ পেত, রামদা তাদের মধ্যে একজন।

স্বামীজী অফিসে ঢুকে গেলেন। আমাদের বাঁচনোর জন্যে রামদাকে অনুনয়-বিনয় করতেই ও বলল, ''সাঁতার কাটতে যাওয়া একদম উচিত হয়নি। যদি জলে ডুবে যেতে? কী কেলেঙ্কারি হত ভাবতে পারছ? এখন হস্টেলে চলে যাও। স্বামীজীর রাগ পড়লে আমি একবার বলে দেখব।''

এইটুকু আশ্বাস সেদিন আমাদের কোনও ভরসা দেয়নি। ভেবেছিলাম, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরও বাঁচাতে পারবেন না। কাল সকালেই আমাদের মৃত্যু! আতঙ্কের মধ্যে সকাল হল। স্কুলেও গেলাম।

বিকেলে আশ্রমবাসী প্রবীণ ও প্রথম শিক্ষক বিধুভূষণ নন্দ তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। গতকাল কী করেছি শুনে, দুজনকে বেশ ভালরকম বেত দিয়ে মারলেন। কৈশোরের দেহ সেই আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়নি, তবে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছিলাম। খুব কেঁদেছি। বন্ধু ও সতীর্থরা দূর থেকে দেখেছে।

বেত্রাঘাত থামিয়ে প্রণম্য বিধুবাবু বলেছিলেন, ''স্বামীজীর আজ্ঞায় তোমাদের এই শাস্তি দিতে হল। শোনো বাবা, সুবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধির মধ্যে যে-কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে। তোমরা অনাথ হতে পার, কিন্তু গাধা নও। স্বামীজীর মতো আমিও বিশ্বাস করি, তোমরা একদিন এই আশ্রমের মুখ উজ্জ্বল করবে।''

আমরা যখন চলে আসছি বিধুবাবু আমাদের দরবেশ খাওয়ালেন। তারপর, মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ''তোমাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে আমি কষ্ট পেয়েছি। আর এই খবর শুনে স্বামীজীর চোখ জলে ভরে উঠবে। আশ্রম-বালকরাই পুণ্যানন্দ স্বামীর আরাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর জীবনদেবতা। তাদের জন্যই স্বামীজীর সব ভালবাসা।''

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ওখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। রহড়ার টিমটা ছিল বেশ বড়—স্বামীজী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ছাড়া একটি নাট্যদল, সংগীতের দল এবং পূজার্চনায় সহায়তা করার জন্য এবং ভিড় সামাল দেওয়ার জন্যে কয়েকজন বলশালী কিশোর। টিমলিডার স্বামীজী। আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছিলাম। এর মধ্যে একদিন মহারাজদের ভোজনের সময় হইরই কাণ্ড! আসনপিঁড়ি হয়ে সাধুরা প্রসাদ গ্রহণ করছেন। এমন সময় শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) এক বালতি তরকারি নিয়ে পরিবেশনে হাত লাগিয়েছেন। ওই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে স্বামীজী প্রায় দৌড়ে গিয়ে রামময় মহারাজের হাত থেকে বালতিটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন আর বলছেন, ''এ কী দাদা, আপনি মায়ের সন্তান। আমরা ছোটরা থাকতে আপনি বালতি টানছেন! এ কখনও হতে পারে? আপনি বসুন, আমি পরিবেশন করছি।'' কিন্তু গৌরীশ্বরানন্দজী গোঁ ধরে আছেন। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ভরত মহারাজের হস্তক্ষেপে রণক্ষেত্র শমিত হল। অন্য একজন সন্ন্যাসী কাজটির ভার নিলেন। সাক্ষাৎ মায়ের শিষ্যের প্রতি স্বামীজীর এই সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের সেকেন্ড টিমলিডার কৃষ্ণকমল মহারাজ (স্বামী নিত্যানন্দ) পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

রহড়া আশ্রমের প্রসার এবং উন্নতির জন্য স্বামীজীর পঁচিশ বছরের নিরলস সাধনার রথ যেদিন থেমে গেল, সেদিন রহড়া আশ্রমের আপন অভ্যন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল হাহাকার। তীব্র আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে শহরতলি হয়ে ওঠা রহড়ায়। ভেবেছিলাম, আমরা আবার অনাথ হয়ে গেলাম! যেদিন তাঁর নশ্বর শরীর দেবলোকে বিলীন হল, সেদিন গভীর রাত্রে এক সন্ন্যাসী বললেন, ''এমন কথা কখনও ভাববে না।'' যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হওয়ার পর রেঙ্গুন সেবাশ্রম পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেলুড় মঠ। ট্রাস্টিরা এই কাজের জন্য পুণ্যানন্দকেই নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ, বিবেকানন্দের ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্য, স্বামী বিরজানন্দ এই সিদ্ধান্ত শুনে বলেছিলেন, ''রহড়ার ছেলেগুলো আবার অনাথ হয়ে যাবে।'' ট্রাস্টিরা অধ্যক্ষ মহারাজের মন্তব্য শুনে বিরত হন। আমাদের স্বামীজী সেদিন থেকে যেমন আজীবন এখানে থেকে গেছেন, আজও তেমনই সূক্ষ্ম শরীরে তিনি আশ্রমের সর্বত্র বিরাজমান। এ আমাদের কাছে আশীর্বাদ।